فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ ﴿٣٥﴾ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ
غِسْلِيْنٍ ﴿٣٦﴾ لَّا يَاْكُلُهٗٓ اِلَّا الْخٰطِـُٔوْنَ ﴿٣٧﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا
تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٨﴾ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ ﴿٣٩﴾ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ
كَرِيْمٍ ﴿٤٠﴾ وَّمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۗ قَلِيْلًا مَّا تُؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾
وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَذَكَّرُوْنَ ﴿٤٢﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ ﴿٤٤﴾
لَاَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿٤٦﴾ فَمَا
مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ عَنْهُ حٰجِزِيْنَ ﴿٤٧﴾ وَاِنَّهٗ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٤٨﴾
وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿٤٩﴾ وَاِنَّهٗ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٥٠﴾
وَاِنَّهٗ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٥٢﴾

سُوْرَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ اَرْبَعٌ وَاَرْبَعُوْنَ اٰيَةً وَفِيْهَا رُكُوْعَانِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ
لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ
الرُّوْحُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾

(৩৫) অতএব, আজকের দিন এখানে তার কোন সুহৃদ নাই। (৩৬) এবং কোন খাদ্য নাই, ক্ষত-নিঃসৃত পুঁজ ব্যতীত। (৩৭) গোনাহ্গার ব্যতীত কেউ এটা খাবে না। (৩৮) তোমরা যা দেখ, আমি তার শপথ করছি (৩৯) এবং যা তোমরা দেখ না, তার—(৪০) নিশ্চয়ই এই কোরআন একজন সম্মানিত রসূলের আনীত। (৪১) এবং এটা কোন কবির কালাম নয়; তোমরা কমই বিশ্বাস কর। (৪২) এবং এটা কোন অতীন্দ্রিয়বাদীর কথা নয়; তোমরা কমই অনুধাবন কর। (৪৩) এটা বিশ্বপালনকর্তার কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা রচনা করত, (৪৫) তবে আমি তার দক্ষিণ হস্ত ধরে ফেলতাম, (৪৬) অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবা। (৪৭) তোমাদের কেউ তাকে রক্ষা করতে পারতে না। (৪৮) এটা খোদাভীরুদের জন্যে অবশ্যই একটি উপদেশ। (৪৯) আমি জানি যে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ মিথ্যারোপ করবে। (৫০) নিশ্চয় এটা কাফেরদের জন্যে অনুতাপের কারণ। (৫১) নিশ্চয় এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব, আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন।

সূরা আল-মা'আরিজ

মক্কায় অবতীর্ণঃ আয়াত ৪৪

পরম করুণাময় ও অসীম দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু

(১) একব্যক্তি চাইল, সেই আযাব সংঘটিত হোক যা অবধারিত—(২) কাফেরদের জন্যে, যার প্রতিরোধকারী কেউ নেই। (৩) তা আসবে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সমুন্নত মর্তবার অধিকারী। (৪) ফেরেশতাগণ এবং রূহ আল্লাহ্ তাআলার দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।

আল্লাহ্ তাআলার আরশ কি? এর স্বরূপ ও প্রকৃত আকার-আকৃতি কি? ফেরেশতারা কিভাবে একে বহন করছে? এসব প্রশ্নের সমাধান মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি দিতে পারে না এবং এসব বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা কিংবা প্রশ্ন উত্থাপন করার অনুমতি নেই। এ ধরনের যাবতীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেয়ীদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এসব বিষয়ে আল্লাহ্ তাআলার উদ্দেশ্য সত্য এবং স্বরূপ অজ্ঞাত বলে বিশ্বাস করতে হবে।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ —অর্থাৎ, সেদিন সবাই পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হবে। কোন আত্মগোপনকারী আত্মগোপন করতে পারবে না। আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞান ও দৃষ্টি থেকে আজ দুনিয়াতেও কেউ আত্মগোপন করতে পারে না। সেই দিনের বিশেষত্ব সম্ভবতঃ এই যে, হাশরের ময়দানে সমস্ত ভূপৃষ্ঠ সবটি সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হবে। গর্ত, পাহাড়, ঘর-বাড়ী, বৃক্ষ ইত্যাদি আড়াল বলতে কিছুই থাকবে না। দুনিয়াতে এসব বস্তুর পশ্চাতে আত্মগোপনকারীরা আত্মগোপন করে। কিন্তু সেখানে কিছুই থাকবে না। ফলে কেউ আত্মগোপন করার জায়গা পাবে না।

هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ - هَآؤُمُ -শব্দের অর্থ না। উদ্দেশ্য এই যে, যার আমলনামা ডানহাতে আসবে, সে আহলাদে আটখানা হয়ে আশেপাশের লোকজনকে বলবেঃ নাও, আমার আমলানামা পাঠ করে দেখ।

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ - سلطان — শব্দের অর্থ ক্ষমতা ও আধিপত্য। তাই রাষ্ট্রকে সুলতানাত এবং রাষ্ট্রনায়ককে সুলতান বলা হয়। উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে অন্যদের উপর আমার ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল। আমি সবার বড় একজন। আজ সেই রাজত্ব ও প্রাধান্য কোন কাজে আসল না। سلطان -এর অপর অর্থ প্রমাণ, সনদও হতে পারে। তখন অর্থ হবে, হায়! আজ আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমার হাতে কোন সনদ নেই।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ —অর্থাৎ, ফেরেশতাদেরকে আদেশ করা হবেঃ এই অপরাধীকে ধর এবং তার গলায় বেড়ি পরিয়ে দাও। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে যে, এই আদেশ উচ্চারিত হলে সব প্রাচীর ইত্যাদি সব বস্তু তাকে ধরার জন্যে দৌড় দিবে।

ثُمَّ فِيْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ —অতঃপর তাকে সত্তর গজ দীর্ঘ এক শিকলে গ্রথিত করে দাও। শৃঙ্খলিত করার অর্থও রূপকভাবে নেয়া যায়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে মোতি অথবা তসবীহ্‌র দানা গ্রথিত করার ন্যায় শিকল দেহে বিদ্ধ করে অপর দিক থেকে বের করে দেয়া। কোন কোন হাদীসে এই আক্ষরিক অর্থেরও সমর্থন আছে।—(মাযহারী)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ - حميم এর অর্থ সুহৃদ। غِسْلِيْن সেই পানি, যদ্দ্বারা জাহান্নামীদের ক্ষতের পুঁজ ইত্যাদি ধৌত করা হবে। আয়াতের অর্থ এই যে, আজ তার কোন সুহৃদ তাকে কোনরূপ সাহায্য করতে পারবে না এবং আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবে না। তার খাদ্য জাহান্নামীদের ক্ষতধৌত নোংরা পানি ব্যতীত কিছু

হবে না। "কিছু হবে না" এর অর্থ তফসীরের সারসংক্ষেপে এই বলা হয়েছে যে, কোন সুখাদ্য হবে না। ক্ষতধৌত পানির অনরূপ অন্য কোন নোংরা খাদ্য হতে পারবে; যেমন অন্য আয়াতে জাহান্নামীদের খাদ্য যাক্কুম উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব, উভয় আয়াতে কোন বৈপরিত্য নেই।

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ –অর্থাৎ, সেইসব বস্তুর শপথ, যা তোমরা দেখ অথবা দেখতে পার এবং যা তোমরা দেখনা ও দেখতে পার না। এতে সমগ্র সৃষ্টি এসে গেছে। কেউ কেউ বলেন ঃ 'যা দেখনা' বলে আল্লাহ্ তাআলার সত্তা ও গুণাবলী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ যা দেখ বলে দুনিয়ার বস্তুসমূহ এবং 'যা দেখ না' বলে পরকালের বিষয়সমূহ বোঝানো হয়েছে।—(মাযহারী)।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا — تَقَوَّلَ শব্দের অর্থ কথা রচনা করা। وتين হৃদয় থেকে নির্গত সেই শিরাকে বলা হয়, যার মাধ্যমে আত্মা মানবদেহে বিস্তার লাভ করে। এই শিরা কেটে দিলে তাৎক্ষণিক মৃত্যু হয়ে যায়।

কাফেরদের কেউ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে কবি এবং তাঁর কালামকে কবিতা, কেউ

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ —এর আগে আয়াতসমূহে বলা হয়েছিল যে, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) নিজের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেন না। তিনি আল্লাহ্র কালামই বলেন। এই কালাম খোদাভীরুদের জন্যে উপদেশ। কিন্তু আমি একথাও জানি যে, এসব অকাট্য ও নিশ্চিত বিষয়াদি জানা সত্ত্বেও অনেক লোক মিথ্যারোপ করতে থাকবে। এর পরিণাম হবে পরকালে তাদের অনুশোচনা ও সার্বক্ষণিক আযাব। অবশেষে বলা হয়েছেঃ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ —অর্থাৎ, এটা পুরোপুরি সত্য ও নিশ্চিত। এতে সন্দেহ ও সংশয়ের অবকাশ নেই। অবশেষে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে ঃ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ —এতে ঈঙ্গিত আছে যে, আপনি এই হঠকারী কাফেরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না এবং দুঃখিতও হবেন না; বরং আপনার মহান পালনকর্তার পবিত্রতা ও প্রশংসা ঘোষণায় নিজেকে নিয়োজিত করুন। এটাই সব দুঃখ থেকে মুক্তির উপায়। অন্য এক আয়াতে এর অনুরূপ বলা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ —অর্থাৎ, আমি জানি আপনি কাফেরদের অর্থহীন কথাবার্তায় মনঃক্ষুণ্ণ হন। এর প্রতিকার এই যে, আপনি আপনার পালনকর্তার প্রশংসায় মশগুল হয়ে যান এবং সেজদাকারীদের দলভুক্ত হয়ে যান। কাফেরদের কথার দিকে ভ্রূক্ষেপ করবেন না।

আবু দাউদ হযরত ওকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেন, যখন فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বললেন ঃ এতে তোমাদের রুকূতে রাখ। অতঃপর যখন سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতখানি নাযিল হয়, তখন তিনি বললেন ঃ একে তোমাদের সেজদায় রাখ। এ কারণেই সর্বসম্মতভাবে রুকূ ও সেজদায় এই দু'টি তসবীহ্ পাঠ করা হয়। অধিকাংশ ইমামের মতে এগুলো তিন বার পাঠ করা সুন্নত। কেউ কেউ ওয়াজেবও বলেছেন।

সূরা হাক্কাহ্ সমাপ্ত

সূরা আল-মাআরিজ

سَأَلَ سَائِلٌ - سؤال শব্দটি কখনও তথ্যানুসন্ধানের অর্থে আসে। তখন আরবী ভাষায় এর সাথে عن অব্যয় ব্যবহৃত হয় এবং কখনও আবেদন ও কোন কিছু চাওয়ার অর্থে আসে। আয়াতে এই অর্থে আসার কারণে এর সাথে ب অব্যয় ব্যবহৃত হয়েছে। কাজেই বাক্যের অর্থ এই যে, এক ব্যক্তি আযাব চাইল। নাসায়ীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, নযর ইবনে হারেছ এই আযাব চেয়েছিল। সে কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি মিথ্যারোপ করতে যেয়ে ধৃষ্টতাসহকারে বলেছিল وَإِذْ قَالُوا اللّٰهُمَّ إِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيْمٍ হে আল্লাহ্! যদি এই কোরআনই আপনার পক্ষ থেকে সত্য হয়, তবে আমাদের উপর আকাশ থেকে প্রস্তর বর্ষণ করুণ অথবা অন্য কোন যন্ত্রণাদায়ক আযাব প্রেরণ করুন।—(মাযহারী) আল্লাহ্ তাআলা তাকে বদর যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে শাস্তি দেন।—(মাযহারী) সে আল্লাহ্ তাআলার কাছে যে আযাব চেয়েছিল, অতঃপর তার কিছু স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে যে, এই আযাব কাফেরদের জন্যে দুনিয়াতে কিংবা পরকালে কিংবা উভয় জাহানে অবধারিত। একে প্রতিহত করার সাধ্য কারও নেই। এটা আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে, যিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই শেষ বাক্যটি প্রথম বাক্যের প্রমাণ। কারণ, যে আযাব মহান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে আসে, তাকে প্রতিহত করা কারও পক্ষে সম্ভবপর নয়।'

معارج শব্দটি معراج –এর বহুবচন। এটা عروج থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ উর্ধ্বারোহণ করা। معراج ও معرج সেই সিঁড়িকে বলা হয়, যাতে নীচে থেকে উপরে আরোহণ করার জন্যে অনেকগুলো স্তর থাকে। আয়াতে আল্লাহ্ তাআলার বিশেষণ ذِي الْمَعَارِجِ এই অর্থে আনা হয়েছে যে, তিনি সুউচ্চ মর্তবার অধিকারী। এই সুউচ্চ মর্তবা হচ্ছে উপরে-নীচে সপ্ত আকাশ। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) ذِي الْمَعَارِجِ এর অর্থ করেছেন আকাশসমূহের মালিক।

تَعْرُجُ الْمَلٰئِكَةُ وَالرُّوْحُ –অর্থাৎ, উপরে নীচে স্তরে স্তরে সাজানো এই মর্তবাসমূহের মধ্যে ফেরেশতাগণ ও 'রুহুল-আমীন' অর্থাৎ, জিবরাঈল আরোহণ করেন। জিবরাঈল ফেরেশতাগণেরই একজন। কিন্তু তার বিশেষ সম্মানের কারণে তাঁর পৃথক নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَةٍ —অর্থাৎ, উল্লেখিত আযাব সেই দিন সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। হযরত আবু ছাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন ঃ আমার প্রাণ যে সত্তার করায়ত্ত, তাঁর শপথ করে বলছি—এই দিনটি মুমিনের জন্যে একটি ফরয নামায পড়ার সময়ের চেয়েও কম হবে।—(মাযহারী)।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে নিম্নোক্ত হাদীসে বর্ণিত আছে, يكون على المؤمنين كمقدار ما بين الظهر والعصر —অর্থাৎ, এই দিনটি মুমিনদের জন্যে যোহর ও আছরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।—(মাযহারী)।

এসব হাদীস থেকে জানা গেল যে, পঞ্চাশ হাজার বছর হওয়া একটি আপেক্ষিক ব্যাপার। অর্থাৎ, কাফেরদের জন্যে এতটুকু দীর্ঘ এবং

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ﴿٥﴾ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿٦﴾ وَنَرَاهُ
قَرِيبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُونُ الْجِبَالُ
كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ﴿١٠﴾ يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ
الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ ﴿١١﴾ وَ
صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِي
الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً
لِلشَّوَىٰ ﴿١٦﴾ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ ﴿١٨﴾ إِنَّ
الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ﴿٢٠﴾ وَإِذَا مَسَّهُ
الْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿٢١﴾ إِلَّا الْمُصَلِّينَ ﴿٢٢﴾ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ
دَائِمُونَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ﴿٢٤﴾
لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿٢٦﴾
وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿٢٧﴾ إِنَّ عَذَابَ
رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾
إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ
مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

(৫) অতএব, আপনি উত্তম সবর করুন। (৬) তারা এই আযাবকে সুদূরপরাহত মনে করে, (৭) আর আমি একে আসন্ন দেখছি। (৮) সেদিন আকাশ হবে গলিত তামার মত। (৯) এবং পর্বতসমূহ হবে রঙ্গিন পশমের মত (১০) বন্ধু বন্ধুর খবর নিবে না। (১১) যদিও একে অপরকে দেখতে পাবে। সেদিন গোনাহ্গার ব্যক্তি পণস্বরূপ দিতে চাইবে তার সন্তান-সন্ততিকে, (১২) তার স্ত্রীকে, তার ভ্রাতাকে, (১৩) তার গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিত (১৪) এবং পৃথিবীর সবকিছুকে, অতঃপর নিজেকে রক্ষা করতে চাইবে। (১৫) কখনই নয়। নিশ্চয় এটা লেলিহান অগ্নি, (১৬) যা চামড়া তুলে দিবে। (১৭) সে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছিল ও বিমুখ হয়েছিল, (১৮) সম্পদ পুঞ্জীভূত করেছিল, অতঃপর আগলিয়ে রেখেছিল। (১৯) মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। (২০) যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশ করে। (২১) আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। (২২) তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা নামায আদায়কারী। (২৩) যারা তাদের নামাযে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। (২৪) এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে (২৫) যাচ্ঞাকারী ও বঞ্চিতের (২৬) এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। (২৭) এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। (২৮) নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না। (২৯) এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, (৩০) কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না, (৩১) অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী।

মুমিনদের জন্যে এতটুকু খাট হবে।

কেয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য এক হাজার বছর, না পঞ্চাশ হাজার বছর? আলোচ্য আয়াতে কেয়ামত দিবসের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর এবং সূরা তানযীলের আয়াতে এক হাজার বছর বলা হয়েছে। আয়াতটি এই ঃ

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ —আল্লাহ্ তাআলার কাজ কর্ম পরিচালনা করে আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত, অতঃপর তাঁর দিকে উর্ধ্বগমন করেন এমন এক দিনে যা তোমাদের হিসাব অনুযায়ী এক হাজার বছরের সমান। বাহ্যতঃ উভয় আয়াতের মধ্যে বৈপরিত্য আছে। উপরোক্ত হাদীস দৃষ্টে এর জওয়াব হয়ে গেছে যে, সেই দিনের দৈর্ঘ্য বিভিন্ন দলের দিক দিয়ে বিভিন্ন রূপ হবে। কাফেরদের জন্যে পঞ্চাশ হাজার বছর এবং মুমিনদের জন্যে এক নামাযের ওয়াক্তের সমান হবে। তাদের মাঝখানে কাফেরদের বিভিন্ন দল থাকবে। সম্ভবতঃ কোন কোন দলের জন্যে এক হাজার বছরের সমান থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে সময় দীর্ঘ ও খাট হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিধিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘন্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশী মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত অনুভূত হয়।

যে আয়াতে এক হাজার বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তফসীরে-মাযহারীতে বলা হয়েছে, এই আয়াতে পার্থিব একদিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিবরাঈল ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন, যা মানুষে অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগত। কেননা, সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত আছে, আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত পাঁচশত বছরের ব্যবধান আছে। অতএব, পাঁচশত বছর নীচে আসার এবং পাঁচশত বছর উর্ধ্ব গমনের ফলে মোট এক হাজার বছর মানুষের গতির দিক দিয়ে হয়ে যায়। ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুবই সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সুতরাং সূরা তানযীলের আয়াতে পার্থিব হিসাবেই 'একদিন' বর্ণিত হয়েছে এবং সূরা-মা'আরিজে কেয়ামতের দিন বিধৃত হয়েছে, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্যে তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا —এখানে স্থান ও কালের দিক দিয়ে দূর ও নিকট বোঝানো হয়নি ; বরং সম্ভাব্যতার ও বাস্তবতার দূরবর্তীতা বোঝানো হয়েছে। আয়াতের অর্থ এই যে, তারা কেয়ামতের বাস্তবতা—বরং সম্ভাব্যতাকেও সুদূর পরাহত মনে করে আর আমি দেখছি যে, এটা নিশ্চিত।

وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ — حميم শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ ও অকৃত্রিম বন্ধু। কেয়ামতের দিন কোন বন্ধু বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করবে না—সাহায্য করা দূরের কথা। জিজ্ঞাসা না করার কারণ সামনে না থাকা নয় ; বরং আল্লাহ্ তাআলার কুদরতে তাদের সবাইকে একে অপরের সামনেও করে দিবে। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে এমন ব্যস্ত থাকবে

যে, কেউ অপরের কষ্ট ও সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে পারবে না।

كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ — لظى শব্দের অর্থ অগ্নির লেলিহান শিখা। شوى শব্দটি شواة এর বহুবচন। অর্থ মাথা ও হাত-পায়ের চামড়া। অর্থাৎ, জাহান্নামের অগ্নি একটি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা হবে, মস্তিষ্ক অথবা হাত-পায়ের চামড়া খুলে ফেলবে।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ এই অগ্নি নিজে সেই ব্যক্তিকে ডাকবে, যে সত্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে ; বিমুখ হয় এবং ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত করে তা আগলিয়ে রাখে। পুঞ্জিভূত করার অর্থ অবৈধ পন্থায় পুঞ্জিভূত করা এবং আগলিয়ে রাখার অর্থ ফরয ও ওয়াজেব হক আদায় না করা। সহীহ্ হাদীসে তাই অর্থ করা হয়েছে।

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا - هلوع -এর শাব্দিক অর্থ লোভী, অধৈর্য ভীরু ব্যক্তি। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে অর্থ সেই ব্যক্তি, যে হারাম ধন-সম্পদের লোভ করে। সাইদ ইবনে জুবায়র (রাঃ) বলেন ঃ এর অর্থ কৃপণ এবং মুকাতিল বলেন ঃ এর অর্থ সংকীর্ণমনা ধৈর্যহীন ব্যক্তি। এসব অর্থ কাছাকাছি। স্বয়ং কোরআনের ভাষায় هلوع শব্দের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, যখন তাকে সৃষ্টিই করা হয়েছে দোষযুক্ত অবস্থায়, তখন তাকে অপরাধী কেন সাব্যস্ত করা হয়? জওয়াব এই যে, এখানে মানব-স্বভাবে নিহিত প্রতিভা ও উপকরণ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা মানব-স্বভাবে সৎকাজের প্রতিভাও নিহিত রেখেছেন, তাকে জ্ঞান-গরিমাও দান করেছেন। কিতাব এবং রসূলের মাধ্যমে প্রত্যেক ভাল-মন্দ কাজের পরিণতিও বলে দিয়েছেন। মানুষ স্বেচ্ছায় জন্মলগ্নে গচ্ছিত মন্দ উপকরণের কারণে অপরাধী হয় না। هلوع শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোরআন পাক স্বেচ্ছাধীন ক্রিয়াকর্মই উল্লেখ করেছে। বলা হয়েছেঃ

إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا অর্থাৎ, মানুষ এত ভীরু ও বে-সবর যে, যখন সে কোন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয়, তখন হা-হুতাশ শুরু করে দেয়। পক্ষান্তরে যখন কোন সুখ-শান্তি ও আরাম লাভ করে, তখন কৃপণ হয়ে যায়। এখানে শরীয়তের সীমার বাইরে হা-হুতাশ বোঝানো হয়েছে। এমনিভাবে কৃপণতা বলে ফরয ও ওয়াজেব কর্তব্য পালনে ত্রুটি বোঝানো হয়েছে। অতঃপর সাধারণ মানুষের এই বদ-অভ্যাস থেকে সৎকর্মী মুমিনদের ব্যতিক্রম প্রকাশ করে তাদের সৎ ক্রিয়াকর্ম উল্লেখ করা হয়েছে। এই ব্যতিক্রম إِلَّا الْمُصَلِّينَ থেকে শুরু করে عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ পর্যন্ত বর্ণিত হয়েছে। এখানে مصلين শব্দ বলে مؤمنين বুঝিয়ে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামায মুমিনের সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ আলামত। যারা নামাযী, তারাই মুমিন বলার যোগ্য হতে পারে। অতঃপর তাদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ —অর্থাৎ, যে নামাযী তার সমগ্র নামাযের নামাযে দিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখে ; এদিক সেদিক তাকায় না। ইমাম বগভী (রহঃ) বর্ণিত রেওয়ায়েতে আবুল খায়র বলেন ঃ আমি সাহাবী হযরত ওকবা ইবনে আমের (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের অর্থ কি এই যে, যারা সর্বক্ষণ নামায পড়ে? তিনি বললেন ঃ না, এই অর্থ নয় ; বরং উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নামাযের দিকেই নিবিষ্ট থাকে এবং ডানে-বামে ও আগে-পিছে তাকায় না। অতঃপর وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ বাক্যে নামায ও নামাযের আদবসমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কাজেই বিষয়বস্তুতে পুনরুক্তি নেই। এর পরে উল্লেখিত মুমিনদের গুণাবলী প্রায় তাই, যা সূরা মুমিনুনে বর্ণিত হয়েছে।

যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নির্ধারিত, তা হ্রাসবৃদ্ধি করার ক্ষমতা কারও নেই ঃ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ—এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, যাকাতের পরিমাণ আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছ থেকে সহীহ্ হাদীসসমূহে বর্ণিত আছে। তাই যাকাতর নেসাব ও পরিমাণ উভয়টি আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে স্থিরীকৃত। কাল ও অবস্থার পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হতে পারে না।

فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ —এর পূর্বের আয়াতে যৌনকামনা চরিতার্থ করার বৈধ পাত্র বিবাহিতা স্ত্রী ও মালিকানাধীন বাঁদী উল্লেখ করা হয়েছে। এই আয়াতে এগুলো ছাড়া যৌনকামনা চরিতার্থ করার প্রত্যেক প্রকারকে নিষিদ্ধ ও অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।